গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২৫ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চাই

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রূপ বর্তমানে এত শ্রীনগ্ন হয়ে গিয়েছে যে, তার আসল চরিত্র চিনতে বিশ্বের জনগণের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। মাত্র ১৫ বছর আগে ১৯৯০ সালে পরিস্থিতি এরকম ছিল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সেটাই প্রথম সামরিক আগ্রাসন। সোভিয়েট ইউনিয়ন তখনও পুরোপুরি ভেঙে যায়নি, যদিও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ততদিনে প্রতিবিপ্লব ঘটে গিয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিচ্যুতির যে ধারা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব থেকে শুরু হয়েছিল, গরবাচেভ নেতৃত্বের সময়ে তা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ন্যূনতম অবস্থানও তখন সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্র ত্যাগ করেছে। শ্রেণী রাজনীতি ছুঁড়ে ফেলে গরবাচভ নেতৃত্ব তখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধ্বজা উড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে প্রকাশ্যেই মিতালি করেছে।

এই সময় ইরাক-কুয়েতের পুরনো বিবাদকে খুঁচিয়ে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটি ধূর্ত চাল দেয়। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন, বিশ্ব পরিস্থিতি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বুঝতে ব্যর্থ হয়ে, সাম্রাজ্যবাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে কুয়েত আক্রমণ করে বসেন। তৎক্ষণাৎ আমেরিকা হুঙ্কার দেয়। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক করে ইরাককে শাস্তি দেওয়ার ও কুয়েত 'মুক্ত' করার 'দায়িত্ব' নিয়ে নেয় আমেরিকা। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম গোটা বিশ্বে একথাই ছড়িয়ে দেয় যে, সাদ্দাম হুসেন পররাজ্য দখলকারী ; অতএব কুয়েতকে ইরাকের কবজা থেকে 'মুক্ত' করার জন্য 'ন্যায়ের দণ্ড' নিয়ে আমেরিকাকে আক্রমণে যেতেই হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সমস্ত ঘটনায় কার্যত হাত গুটিয়ে বসে থাকে। তারপর ১৯৯১ সালে তো প্রতিবিপ্লব সাঙ্গ হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রই ভেঙে যায়, সরাসরি ক্ষমতা দখল করে রুশ পুঁজিপতিশ্রেণী। ওদিকে পরাজিত ইরাকের উপর রাষ্ট্রসংঘের নামে অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকি জনগণকে ভাতে মেরে সাদ্দামবিরোধী গণবিদ্রোহের জমি তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়। সেদিন বিশ্বের সাধারণ মানুষের বেশিরভাগ অংশই সাম্রাজ্যবাদের এইসব মতলব ধরতে পারেনি, মার্কিন প্রচারে তারা অনেকখানি বিভ্রান্ত হয়েছিল।

এরপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৯৯ সালে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় সামরিক হানাদারি চালায়, তখনও দুনিয়াকে তারা বুঝিয়েছিল, যুগোশ্লাভিয়ার ভিতরে 'গৃহযুদ্ধ' ও 'গণহত্যা' বন্ধ করতেই এই আক্রমণ চালাতে হচ্ছে, না হলে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে নতজানু করানো যাচ্ছে না। সাদ্দাম হুসেনের মতো মিলোসেভিচকেও 'রক্তপিপাসু', 'স্বৈরাচারী', 'জাতিবিদ্বেষী' বলে দুনিয়াব্যাপী প্রচার করা হয় এবং বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে সাম্রাজ্যবাদীরা সফল হয়। আমেরিকার আসল লক্ষ্য ছিল, যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরে জাতিবিদ্বেষ খুঁচিয়ে তুলে দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে তাকে দুর্বল করা, তার সামরিক শক্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও আধিপত্যের পথের বাধা খতম করা।

বলকান অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়াই ছিল সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিমান। শেষপর্যন্ত তাকে হীনবল করে দিতে জার্মান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সফল হয়। একটা স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে দেশ থেকে তুলে এনে বিচারের প্রহসন চালানো হয় আন্তর্জাতিক আদালতে। মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে যদিও একটি অভিযোগও সাম্রাজ্যবাদীরা প্রমাণ করতে পারেনি, তবু তিনি আজও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বন্দী। একদা অখণ্ড ও শক্তিশালী যুগোশ্লাভিয়া এখন খণ্ড খণ্ড হয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দয়ার উপর নির্ভরশীল। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মতোই

যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনীতিও এখন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুঠের জালে আটকা পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য তো এটাই। যেখানে কেবল চাপ দিয়ে বা বাণিজ্যের জালে বেঁধে একাজ সে করতে পারে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সামরিক দখলে যায় না। কিন্তু শান্তির ভেকই হোক, আর আগ্রাসী মূর্তিই হোক, সাম্রাজ্যবাদের মূল স্বার্থ নগ্ন অর্থনৈতিক শোষণ, যাকে ভিত্তি করেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাজনীতিটাও পরিচালিত হয়।

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। কলকাতা ঃ ৫ জুন, ২০০৪

ইরাকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে দখলদাররা

২৮ বছরের ইরাকি ডাক্তার সালাম ইসমাইল এখন ইরাকের ডাক্তারদের বেসরকারি একটি সংগঠন 'ডক্টরস ফর ইরাক'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আগে ছিলেন ইরাকের জুনিয়র ডাক্তারদের নেতা। সম্প্রতি ইকুয়েডরের কুয়েনকা শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গণস্বাস্থ্য সভার দ্বিতীয় দিনে সকালে মঞ্চে উঠে ১৫ মিনিটের আলোচনায় তিনি তথ্য সহকারে ইরাকের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রিমিনালসুলভ চরিত্রটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দেন বিশ্ববাসীর কাছে। সাদ্দাম হুসেনের শাসন ইরাকি জনগণের জন্য কম মূল্যে রেশনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে করেছিল অবৈতনিক। মানুষের ফ্রি-চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে ইরাক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্তরে উন্নীত করেছিল। বড় বড় শহর শুধু নয়, গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা ক্লিনিকগুলিতেও প্রথমশ্রেণীর চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যেত। সেই ইরাকের চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামোকে মার্কিন হানাদার বাহিনী কোন্ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, জনগণের কী চরম দুর্দশার সৃষ্টি করেছে এবং কীভাবে শিশু-বৃদ্ধ সহ অসুস্থ মানুষ প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই হাজারে হাজারে মরছে এসব শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। কারণ, আমেরিকা এবং তার দালালদের একতরফা প্রচারে বিশ্ববাসী শুনেছে যে, অত্যাচারী শাসক সাদ্দাম হুসেনের কবল থেকে ইরাকের গণতন্ত্র রক্ষার্থেই নাকি আমেরিকা ইরাকে হাজির হয়েছে এবং ইরাকি জনগণের মঙ্গলসাধনই নাকি তাদের একমাত্র লক্ষ্য! ডাক্তার ইসমাইলের ভাষণ মার্কিন ভণ্ডামির সেই মুখোস খুলে দিয়েছে। তিনি জানান, তাঁর সহকর্মী ডাক্তারদের অনেককে মার্কিন সেনারা হত্যা করেছে। যাঁরা বেঁচে আছেন, মার্কিন মদতপুষ্ট বর্তমান প্রশাসন তাদেরকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে, পেটাচ্ছে। ফলে হাজার হাজার ডাক্তার ইরাক ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

জনসভা

২৫ নভেম্বর বিকাল ৪-৩০টা মহাজাতি সদন, কলকাতা

বিষয় ঃ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা

বক্তা ঃ কমরেড নীহার মুখার্জী
(সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই)
কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা (রাশিয়া)
কমরেড হিদার কোটিন (আমেরিকা)
কমরেড খালেকুজ্জামান (বাংলাদেশ)
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

ইরাকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে দখলদাররা

একের পাতার পর

পরে 'থার্ড ওয়ার্ল্ড রিসারজেন্স'- পত্রিকার পক্ষ থেকে বেবেকা খোর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে ডাঃ ইসমাইল বলেন, ইরাকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আগ্রাসনের আগেই জারি করা অবরোধ ইরাকি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করেছে। আগে ইরাকে মানুষ যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেত, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন তা মাত্র ৪.৫ শতাংশ কার্যকর ছিল। কিন্তু এখন ইরাকে সেই পরিষেবা শূন্য। খাদ্যাভাবে অপুষ্টির মাত্রা এখন মারাত্মক। ইরাকের অবস্থা এখন আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলির মত। বিদেশি সেনারা দেশের অধিকাংশ চিকিৎসা-পরিকাঠামোই ধ্বংস করে দিয়েছে। হাসপাতালগুলোকে লুঠ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ নেই, জেনারেটরের ব্যবস্থা নেই। সশস্ত্র হামলায় ও বোমার আঘাতে সব ধ্বংস হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার সময়ে হৃদরোগ ও অন্যান্য সাধারণ অসুখের চিকিৎসার ওষুধসহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপত্র সরবরাহের একটা কর্মসূচি ছিল; এখন সেই কর্মসূচি আর কাজ করছে না। নির্দিষ্ট ৯০০টি অত্যাবশ্যক ওষুধের মধ্যে শতকরা ৪৫টি এখন ইরাকে পাওয়াই যাচ্ছে না; অবশিষ্টগুলির সরবরাহও খুব কম।

তিনি জানান, ইরাকের স্বাস্থ্য পরিষেবা আগে ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণে। মার্কিন দখলদারির পর সব তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি হাতে। ফল ভুগছে ইরাকি জনগণ। যুদ্ধের আগে সমস্ত হাসপাতালে তরল অক্সিজেন সরবরাহ করা হত লিটার পিছু ১৫০ দিনার দামে। যুদ্ধের পর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলির বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং তরল অক্সিজেনের লিটার প্রতি দাম লাফ দিয়ে এখন ১৫০০ দিনার। মার্কিন কন্ট্রাক্টররা নির্মাণ প্রকল্পের বরাত কুক্ষিগত করে বিপুল মুনাফা লুটছে। যেমন, হাসপাতালগুলোতে একেবারে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা দেবার ব্যবস্থাই যেখানে রাখা হয়নি, সেখানে, হাসপাতালে কম্পিউটার সরবরাহ করছে মার্কিন কোম্পানিগুলো।

তিনি বলেন, যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী, দখলদার সেনাবাহিনীরই দায়িত্ব হল পরাজিত রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। কিন্তু ইরাকে এখন হাসপাতালের ডাক্তারদেরই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে হাসপাতালের ছাদে পাহারা দিতে হচ্ছে লুঠতরাজ ঠেকাতে।

ইরাকি বিদ্রোহীরা কি হাসপাতালে বোমা মেরেছে — এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না, এমন একটি ঘটনার কথাও আমার জানা নেই। ৮ মাসে ৪ বার বিমান হানার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। বাগদাদের ১৮টি হাসপাতাল লুঠ করা হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডাক্তারি স্কুল লুণ্ঠিত হয়েছে। অপহরণ ও খুনের ঘটনা আখছার ঘটছে। নিরাপত্তার কোন বালাই নেই। ইরাকি সেনারা ডাক্তারদের ধরে ধরে মারছে, তবুও সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সে বিষয়ে একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি, এমনকী বাস্তবে যা ঘটছে তাকে তারা অস্বীকার করছে। যেসব ডাক্তার সরকারের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন তাঁদেরও পেটানো হচ্ছে। সিনিয়র ডাক্তাররা আতঙ্কিত হয়ে ইরাক ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন ডাক্তারকে অপহরণ করা হয়েছে, কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। আমার চক্ষু বিভাগে ছিলেন ৯ জন ডাক্তার, এখন একজন মাত্র আছেন। ডাক্তারদের একটা প্রজন্মকেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

বাগদাদ ঃ ২০০৩

ডাঃ ইসমাইল বলেন, পশ্চিম ইরাকের হাদিথ-এর হাসপাতালে আমি থাকাকালীনই মার্কিন বাহিনী সেখানে প্রবেশ করে। সেদিন ছিল ২০০৫-এর ৭ মে। মার্কিন বাহিনী হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। তৎক্ষণাৎ মার্কিন সেনারা বিদ্রোহীদের খোঁজার নামে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে, এলোপাথাড়ি বোমা ছোঁড়ে ও গুলি চালায়। এক ল্যাবরেটরি-টেকনিসিয়ানকে তারা গুলি করে মারে, হাসপাতাল বেডেই রোগী ৩৫ বছরের সঈদ জব্বারকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। পশ্চিম ইরাকের প্রধান মেডিক্যাল স্টোরটি এই হাসপাতালেই ছিল। সেনারা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ৯ ঘণ্টা ধরে সেটা জ্বলতেই থাকে। আগুন নেভানোর কোন চেষ্টাই তারা করেনি এবং হাসপাতাল ছেড়ে কেউ বাইরে যাবে না — সেনাদের এই হুকুমের ফলে কেউ বেরিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টাও করতে পারেনি। তিন লক্ষ ডলার মূল্যের মেডিক্যাল সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন, ডাক্তারি শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ মেডিক্যাল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত। আমরা যে কনফারেন্স সেন্টারে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রদের ট্রেনিং দিতাম, সেটিকে মার্কিন বাহিনী কীভাবে ধ্বংস করেছে — আমি তার সাক্ষী। সেন্টারকে মার্কিন মিলিটারি ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছিল। ২০০৩-এর নভেম্বরে সেই ক্যাম্প ছেড়ে যাবার সময় তারা সেন্টারটির অডিও এবং ভিডিও ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে যায়। উন্নত ভিডিও ফটোগ্রাফী ও ফিল্মিং ব্যবস্থা সহ সেন্টারটির বড় তিনটি হলঘর ছিল। সেনারা হলঘরগুলির চেয়ারগুলো পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায় এবং কম্পিউটারগুলো ধ্বংস করে দেয়। মেডিক্যাল ছাত্ররা এইরকম বিপজ্জনক ও অনিবার্য পরিস্থিতির মধ্যে পড়াশুনো চালিয়ে যাবার উপায় দেখতে পাচ্ছে না। ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে হয়েছে তিনটি আলাদা আলাদা দিনে। কারণ, পরীক্ষাগ্রহণের পরিবেশের অভাব এবং ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াতও বিপজ্জনক। ইউনিভার্সিটি আসার পথে রাস্তার ধারে এক আহত মানুষকে সাহায্য করতে যাওয়ার অপরাধে এক মেডিক্যাল ছাত্রকে মাথায় গুলি করে সেনারা হত্যা করেছে।

তিনি জানান, 'ডক্টরস্ ফর ইরাক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৩ সালের অক্টোবরে। মার্কিন আগ্রাসনে বিপন্ন ইরাকি জনগণের সাহায্যে ডাক্তার পাঠাবার জরুরি প্রয়োজন থেকেই এর প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনের দুটি বিভাগ আছে। একটি বিভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষা, ডাক্তারি বইপত্র ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধিতে আলোকপাত করবার জন্য। অন্য বিভাগটি মানবিক বিষয়ে আলোকপাতের জন্য; তারই অঙ্গ হিসেবে ইরাকের আক্রান্ত এলাকাগুলিতে আমরা সার্জেনদের টীম পাঠিয়েছি। ইরাকের উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন আক্রান্ত এলাকায় প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলে আমরা কাজ করছি। এখন 'ডক্টরস্ ফর ইরাক' সংগঠনে আড়াইশ জন ডাক্তার সদস্য রয়েছেন।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে 'গণহত্যাকারী' বলে যারা সাজানো বিচারশালা বসিয়েছে, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ইরাকি দোসররা আজ কীভাবে অসুস্থ ইরাকিদের সামান্য চিকিৎসার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে, ডাঃ ইসমাইলের এই বিবরণ তারই একটি সামান্য অংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ৮ নভেম্বর, '০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেও এক মারাত্মক তথ্য জানা গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন বাহিনী মনে করে ফালুজা হাসপাতাল থেকেই মার্কিন হানায় হতাহতদের বিষয়ে খবরাখবর বাইরে আসছে। সেই কারণে মার্কিন সেনারা হাসপাতালটিকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে। 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার নাওমি ক্লিনও জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয়বার ফালুজা শহরে অবরোধ করে মার্কিন সেনারা বেছে বেছে ডাক্তার, সাংবাদিক ও ধর্মীয় গুরুদের খতম করার পথ নিয়েছে। কারণ, তাদের মতে এই মানুষগুলির কাছ থেকেই জানা যায়, নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী সেনারা কীভাবে নিরীহ ইরাকি নাগরিকদের হত্যা করছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চাই

একের পাতার পর

২০০১ সালে আক্রান্ত হয় আফগানিস্তান। আমেরিকা ও ব্রিটেন দুনিয়াকে বলে, মৌলবাদী তালিবানদের শাসনে আফগানিস্তানে বর্বর রাজ কায়েম হয়েছে, দেশটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আমেরিকার অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পাণ্ডা হিসাবে আমেরিকা ওসামা-বিন-লাদেনকে দায়ী করে এবং বলে, সে আফগানিস্তানে রয়েছে, তাকে ধরতে হবে। এসময় ধীরে ধীরে বিশ্বের জনগণ , বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। একদা আফগানিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে ফেলে দিয়ে 'সোভিয়েট প্রভাব' ঠেকাতে আমেরিকাই যে মৌলবাদী বর্বর তালিবানদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মদত দিয়েছিল, সেই ইতিহাস সামনে চলে আসে। 'কোনও সন্ত্রাসবাদীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে' — শুধু এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রে সামরিক আগ্রাসন চালানো যায় না, বিশ্বজনমতের এই রায় আমেরিকা মানেনি। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘের অনুমতির ছাপ্পা আমেরিকা-ব্রিটেন পেয়ে যায়। আফগানিস্তানকে বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ওসামা বিন লাদেনকে ধরা দূরের কথা, তাকে হাতের কাছে পেয়েও উচ্চপদস্থ কর্তাদের নির্দেশে মার্কিন সেনারা ছেড়ে দেয়। আফগানিস্তানে একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দেওয়া হয়। মার্কিন শাসকরা ঘোষণা করে দেয়, বিশ্বের যেকোন রাষ্ট্রকেই যদি আমেরিকা নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক মনে করে, তবে সেই রাষ্ট্র কিছু করার আগে আমেরিকাই তার বিরুদ্ধে আগাম সামরিক আঘাত হানবে। একথার দ্বারা আমেরিকা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবর্তমানে গোটা বিশ্বের অধিপতি এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

এই ঘোষণা অনুযায়ীই আমেরিকা এরপর টার্গেট করে ইরাককে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকই তখন একমাত্র রাষ্ট্র, যারা তেলকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখেছে। সাদ্দাম হুসেন প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। আমেরিকা ও ব্রিটেন ধুয়া তুলল, সাদ্দাম হুসেন গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি ও মজুত করেছেন, যা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক, অতএব সেগুলি ধ্বংস করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নামে দফায় দফায় পর্যবেক্ষক দল গেল ইরাকে, তারা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কোনও প্রমাণ পেল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। জার্মানি ও ফ্রান্স, যারা এতদিন আমেরিকার পক্ষে মত দিয়ে এসেছে, তারা ইরাক আক্রমণের প্রশ্নে বেঁকে বসল। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন আমেরিকা পেল না। অন্যদিকে তখন খোদ মার্কিন জনগণ লাখে লাখে রাস্তায় নেমে মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ব্রিটেন সহ ইউরোপেও একই ছবি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার বুকে এত বিশাল গণপ্রতিবাদ দেখা যায়নি ; অনেকের মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনেও এত বিশাল সংখ্যায় মার্কিন জনগণের অংশগ্রহণ ঘটেনি।

কিন্তু বেপরোয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজনমতকে দুপায়ে মাড়িয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ রাতের অন্ধকারে ইরাকে আগ্রাসন শুরু করে দেয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া ও আফগানিস্তানে বাধা না পেলেও ইরাক বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেনি। তার চেয়েও বড় কথা, সম্মুখযুদ্ধ দু'মাসে শেষ হয়ে গেলেও, ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ আজও চলছে শুধু নয়, ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসকদের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। ওরা ভেবেছিল অতি অল্পদিনেই ইরাককে দখল করে, পুতুল সরকার বসিয়ে তেলসহ ইরাকের সকল সম্পদকে লুঠের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু দু'বছর অতিক্রান্ত, দেড় লক্ষ মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিতে ও পুতুল সরকারের মাধ্যমে ইরাকের শাসন এখন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে ঠিকই, কিন্তু ইরাকি জনগণকে দখলে আনা যায়নি। প্রতিরোধের আগুনে জ্বলছে ইরাক, গেরিলা যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় প্রতিদিন মারা যাচ্ছে মার্কিন সেনা ও ইরাকি দালালরা। বাগদাদের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকেই শাসকরা হুকুম জারি করছে ; খোলা রাস্তায় বেরোবার উপায় নেই, প্রাণ যাবে। অন্যদিকে ধ্বংস, লুঠ ও বীভৎস অত্যাচারের নয়া ইতিহাস তৈরি করছে আমেরিকা। ইরাকি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মরণপণ লড়াই এখন সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের কাছে প্রেরণা।

পাশাপাশি অন্য আর এক ধরনের লড়াই গড়ে উঠেছে ল্যাটিন আমেরিকায়। 'বিশ্বায়ন', 'মুক্ত বাণিজ্য' ইত্যাদি নামের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের যে বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা হয় জোর করে, না হয় ঐসব দেশের বুর্জোয়া শাসক ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাথে হাত মিলিয়ে চালু করেছে, তার বিষময় ফলের সবচেয়ে বড় সাক্ষী ল্যাটিন আমেরিকা। বছরের পর

আটের পাতায় দেখুন

সাদ্দাম যদি গণহত্যাকারী হন, তবে আমেরিকা কী ?

অবশেষে সাদ্দাম হুসেন বিচারের কাঠগড়ায়। শুরু হয়েছে তাঁর বিচারের প্রহসন। এ এক অদ্ভুত বিচার! যিনি অভিযোগকারী, তিনিই বিচারক, আবার শাস্তিদাতাও তিনিই। আর পুতুলনাচের সুতো যথারীতি মার্কিন প্রভুদের হাতে। তাদেরই বসানো ইরাকি পুতুল সরকারের ব্যবস্থাপনায়, তাদেরই হাতে লণ্ডনে সযত্নে দীর্ঘদিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিচারকদের সামনে আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাকের সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেনকে। কী তাঁর অপরাধ? না, তিনি নাকি ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৪০ জন কুর্দ বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিলেন। অতএব তিনি তো এক নৃশংস গণহত্যার নিষ্ঠুর নায়ক ! সর্বোচ্চ শাস্তি তো তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। বিচার সবে শুরু হয়েছে কি হয়নি, দোষ প্রমাণ আদৌ হবে কি না তার ঠিক নেই, ইতিমধ্যেই ইরাকি পুতুল রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি। তবে তিনি সুসভ্য গণতান্ত্রিক মানুষ কিনা, পশ্চিমী গণতন্ত্রের উদার হাওয়ায় লালিত তাঁর চেতনা, তাই তাঁর আগাম ঘোষণা, তিনি মৃত্যুদণ্ডের ঘোর বিরোধী। তাই সাদ্দামের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় তিনি সই করবেন না। ওইদিন তিনি ছুটি নিয়ে নেবেন। তাঁর অধীন দুই উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে যে কোনও একজন অবশ্য তখন তাঁর হয়ে কাজটি সারতে পারবেন। তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। অর্থাৎ, অভিযোগ যাই হোক, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছু মিলুক, আর নাই মিলুক, দণ্ডের চরিত্র মোটামুটি এখনই স্থির। বিচারের নাটক কেবল দুনিয়ার মানুষকে বোকা বানাবার জন্যই।

তা মৃত্যুদণ্ড তো সাদ্দামের অবশ্যই প্রাপ্য। ইরাকের মতো এক তৈলসমৃদ্ধ দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি কিনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার হিম্মত দেখিয়েছিলেন! তামাম দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের সরকার যখন মার্কিন ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সামনে নতজানু, তাদের দয়াপ্রার্থী, অথবা ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন দীর্ঘ অবরোধের মুখে দাঁড়িয়েও তিনি ছিলেন অনমনীয়, দৃঢ় সঙ্কল্পে অটল, তাঁর দেশ ইরাককে কোনও ভাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে বিকিয়ে যেতে দেবেন না। কী অসম্ভব স্পর্ধা! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা কি এই ধৃষ্টতা মেনে নিতে পারে? ফলে তাঁর দেশের মানুষের সামনে এখন তিনি পরাজিত 'নায়কে' পরিণত। সমস্ত ইরাকবাসীর সামনে এখন তিনি দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক, দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের মরণপণ লড়াই-এর প্রেরণা, এমনকী সমগ্র আরববাসী তথা দুনিয়ার মানুষের সামনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এক অসম সাহসের উদাহরণ। এমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলে তো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! ইরাকি প্রতিরোধকারীদের মুহুর্মুহু প্রতিআক্রমণে থরহরি কম্পমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর পক্ষে কি এতবড় ঝুঁকি নেওয়া কখনও সম্ভব?

অতএব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিচারে সাদ্দাম হুসেনকে মরতেই হবে। তবে বিষয়টির একটা গণতান্ত্রিক মুখোশ তো দরকার, যাতে আসল মতলব আড়াল করা যায়, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সাম্রাজ্যবাদের শত্রুটিকে শেষ করে দেওয়া যায়, আবার তার ফলে দুনিয়াজোড়া বিক্ষোভকেও এই তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক বিচার প্রক্রিয়ার' আড়াল নিয়ে বিভ্রান্ত করা যায়। তবে তার জন্য সাদ্দামের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা দরকার। যেকোনও অভিযোগই চলবে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুতের অভিযোগ বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে মদতের অভিযোগ ইতিমধ্যেই অসার প্রমাণিত। তাহলে এবার গণহত্যার অভিযোগ তোল। সেই অভিযোগেরই বিচার হোক। এ গণহত্যার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, তার কোনও প্রমাণ আছে কি নেই, এসব অতি তুচ্ছ কথা। আসল কথা হল, যেকোনও অজুহাতেই হোক না কেন, সাদ্দামের মৃত্যুদণ্ডকে কার্যকর করতেই হবে। নাহলে এ কীরকম বিচার? ১৪০ জনকে হত্যা করার অভিযোগে 'হত্যাকারীকে' বিচারের কাঠগড়ায় তোলার প্রক্রিয়ায় নারকীয় যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ইরাকে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ ছুঁই ছুঁই। আর এঁদের অধিকাংশই নিরীহ নিরস্ত্র ইরাকি সাধারণ নাগরিক — শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, অসামরিক ব্যক্তি। ১৪০ জন বিদ্রোহীকে হত্যা করাটা গণহত্যা, (যদিও সে অভিযোগের প্রমাণ এখনও বহু দূর), আর তাকে ধরার নামে দেড় লক্ষ মানুষের নির্বিচারে হত্যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত! সেটা গণহত্যা নয়। তার বিচারের কোনও প্রয়োজন নেই। কী অদ্ভুত যুক্তি!

অবশ্য এ ধরনের কীর্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে মোটেই নতুন নয়। নাৎসি অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাৎসি শাসনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধের সম্ভাবনাকেও শিকড়-সুদ্ধ উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে জার্মান গেস্টাপো বাহিনী সেদেশের 'লিডিস' গ্রামটিকে তার সমস্ত নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী-শিশু-বৃদ্ধসহ সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছিল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। গণহত্যার সেই ভয়ঙ্কর কুখ্যাত উদাহরণটি তারপর বারে বারে অনুসৃত হয়েছে মার্কিন হানাদার বাহিনীর দ্বারা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মাইলাই হত্যাকাণ্ড তারই এক বীভৎস উদাহরণ। তবে এই মাইলাই গণহত্যা মোটেই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা ভিয়েতনাম যুদ্ধই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত বোমা বর্ষিত হয়েছিল, ছোট্ট দেশ এক ভিয়েতনামেই এই যুদ্ধে ২০ বছরে বর্ষিত হয়েছিল তার কয়েকগুণ বেশি বোমা। বলাই বাহুল্য, এর পুরোটাই আমেরিকার কীর্তি। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে সাধারণ বোমা যেমন ছিল, ঠিক তেমনই ছিল নানারকমের বিষাক্ত বোমা এবং রাসায়নিক অস্ত্র। তার মধ্যে বিষাক্ত অতি বিস্ফোরক বোমা 'ফুয়েল এয়ার বম্ব', যা 'নাপাম বোমা' নামেই সর্বাধিক পরিচিত, তার বহুল ব্যবহারের জন্য এই যুদ্ধ ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত। যথেচ্ছভাবে এই বোমা বর্ষিত হয়েছিল সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে সমস্ত ধরনের লক্ষ্যবস্তুর উপরেই, যার ফলে মারা যান লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। এত করেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিদ্রোহী জনসাধারণকে বাগে আনতে না পেরে আমেরিকা এরপর শুরু করে পুরোদস্তুর রাসায়নিক হামলা। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ আমেরিকার সম্পূর্ণ পরাজয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রাসায়নিক যুদ্ধে আমেরিকার ছড়ানো মারাত্মক বিষাক্ত 'এজেন্ট অরেঞ্জ' গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায়। ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সির মতে, আক্রান্ত হয় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ, যার ভয়াবহ প্রভাব সেদেশে এখনও বিদ্যমান। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৩০ বছর পরও রাসায়নিক অস্ত্রের বিষক্রিয়ার ফলে এখনও সেখানে জন্ম নেয় নানা বিকলাঙ্গ শিশু, দেখা দেয় নানা দুরারোগ্য ব্যাধি, বহু সুজলা সুফলা জমি থেকে যায় বন্ধ্যা। অথচ এরাই সাদ্দামের বিরুদ্ধে আক্রমণের অজুহাত দিয়েছিল, তিনি নাকি রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুত করছিলেন। অবশ্য সে অজুহাতও আজ ডাহা মিথ্যা প্রমাণিত।

তাদের এ ধরনের নৃশংস গণহত্যার উদাহরণ অবশ্য একা ভিয়েতনামই নয়। আজ মার্কিন শাসকরা দেশে দেশে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির বার্তাবাহী, লক্ষ্য নাকি পৃথিবীকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করা। অথচ আমেরিকার নিজের হাতেই জমে রয়েছে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্র। আর তারা প্রতি মুহূর্তেই এ নিয়ে আজ হুমকি দিয়ে চলেছে কিউবা, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে। অথচ উত্তর কোরিয়া মার্কিন

মার্কিন দখলদারির প্রতিবাদে ও সাদ্দাম হুসেনের মুক্তির দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৩ মসুলে সাদ্দামের প্রতিকৃতি নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ

শাসকদের সরাসরি বলেছে, আমেরিকা যদি এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে তারা কখনই উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করবে না, তবে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক শক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে দেবে। আমেরিকা তাতে রাজি হয়নি, বরং হুমকি বাড়িয়েছে। ইরাকের দৃষ্টান্ত রেখে ইরানকে প্রত্যক্ষ হুমকি দিচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা ঘোষণা করেছে, বিশ্বের যে দেশকেই তারা মার্কিন স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করবে, তার উপরই আগাম আক্রমণ করবে; এই অবস্থায় সেই দেশগুলি কী করবে? আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেবে না?

আজকের দুই দেশে বিভক্ত কোরিয়াও মার্কিন গণহত্যার এরকম বহু নিদর্শন বুকে বহন করে চলেছে। ১৯৫০-৫৩ কোরিয়া যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার অগ্রগতি রুখতে বহু জায়গাতেই ভয়াবহ গণহত্যা চালানো হয়েছিল। এর মধ্যে কুখ্যাত নো-গুন-রি হত্যাকাণ্ড, যেখানে মার্কিন উচ্চতর কমান্ডের সরাসরি নির্দেশে মার্কিন সেনারা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৪০০-রও বেশি নিরস্ত্র কোরিয় চাষী এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের পরিবারকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার কথা দীর্ঘদিন মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয় সরকার চেপে রাখার চেষ্টা করলেও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (২৯ নভেম্বর, ১৯৯৯) ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাতে অংশগ্রহণকারী ৬ জন প্রাক্তন মার্কিন সেনানীর সাক্ষ্যে তা ফাঁস হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে একটি রেলব্রিজের তলায় এই হত্যাকাণ্ডের থেকে দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে যাওয়া কোরিয় মানুষরা অবশ্য এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদেরই একজন চুন ইয়া, সে সময় ১২ বছরের এক বালক, ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়, ''সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই ওরা আমাদের এই রক্তস্নান উপহার দেয়। সামনে পড়ে থাকা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মৃতদেহের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকি। ছোট্ট ছেলেরা যেমন খেলাচ্ছলে মাছি মারে, মার্কিন সেনারা ঠিক সেইভাবে আমাদের মারছিল।'' (তথ্যসূত্র ঃ http://www.workers.org/ww/1999/korea1014.php) ১৯৫০-৫৩ সালের এই কোরিয় যুদ্ধের সময় যে অল্পসময়ের জন্য মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয় সেনারা রাজধানী পিয়ং ইয়ং সহ উত্তর কোরিয়ার একটি বড় অংশ দখল করতে সক্ষম হয়, তার মধ্যেই সেখানে মার্কিন ও জাপানি গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্তত দেড় লাখ লোককে হত্যা করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন পুতুল 'রি' সরকার তো সরাসরি নির্দেশই জারি করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে হত্যা করার। উত্তর কোরিয় বাহিনী দ্রুত সিওল দখল করে সেখানকার বন্দীদের মুক্তি দেওয়ায় যদিও সেখানে শ'খানেকের বেশি বন্দীকে হত্যা করার সুযোগ পাওয়া যায়নি, মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয় সেনা সে আফশোস সুদে আসলে মিটিয়ে নেয় পুসানে। শুধুমাত্র এই একটি জায়গাতেই অন্তত ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। কোরিয়ায় মার্কিন দূতাবাসেরই তৎকালীন অফিসার গ্রেগরি হেন্ডারসনের মতে, সারা দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করার নামে এই ধরনের গণহত্যা চালিয়ে অন্তত ১ লক্ষ মানুষ কে খুন করা হয়। (তথ্যসূত্র ঃ www.kimsoft.com/1997/nogun2.htm)

সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে এরকম অসংখ্য গণহত্যার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কোনটা আলোর মুখ দেখেছে, কোনটা বা আজও দেখেনি। যেমন, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সামুদ্রিক ঝড় 'রুসার' ফলে বেরিয়ে পড়ল এরকমই এক গণকবর। মাসান শহরের নিকটবর্তী ইয়ু-ইয়াং-রি পাহাড়ের ঢালে এই গণকবরে ২০০-টিরও বেশি মৃতদেহ জ্বালানী কাঠের মতই থাক থাক করে সাজিয়ে রাখা ছিল। এখানেই ৫২ বছর আগে দক্ষিণ কোরিয় পুলিশ বাহিনী ১৯৫০-এর ২৫ জুন এদের হত্যা করে। ঘটনাটি ছিল সুবিদিত। কিন্তু মৃতদেহগুলি না পাওয়ায় এতদিন অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা যায় নি। (তথ্যসূত্র ঃ www.kimsoft.com/2002/masan.htm)

দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এরকম অপকীর্তির নজির মিলবে অসংখ্য। যেমন এল সালভাদর। মার্কিন অস্ত্রে সুসজ্জিত সেখানকার সেনাবাহিনীর আক্রমণে মাত্র ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার এই ছোট্ট দেশটিতে ১৯৭৮ থেকে '৯৪ সালের মধ্যে প্রাণ হারান ৭০ হাজার সালভাদরিয় নাগরিক। শুধু তাই নয়, ৫,৪০,০০০ মানুষ এই আক্রমণের ফলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ঠিক সেরকমই গুয়াতেমালায় মার্কিন গোয়েন্দা চক্র সিআইএ'র ষড়যন্ত্রে ঘটানো গৃহযুদ্ধে ৩৫ বছরে নিহত হন ১ লাখ সাধারণ মানুষ। নিখোঁজের সংখ্যা ছাপিয়ে যায় ৬০ হাজারকেও। আর সেখানে এই ভয়ঙ্কর গণহত্যার মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া মানুষের সংখ্যাও দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ। আর ইন্দোনেশিয়ায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

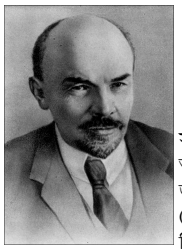

সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে

লেনিন

সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, জাতীয় প্রশ্নেও (জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থে) সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, পদদলিত করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠলে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা, অর্থাৎ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন, সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি, জনসাধারণের দ্বারা প্রশাসক নির্বাচিত করা এই সমস্ত কিছু একই মাত্রায় এবং একইভাবে অর্জন করা প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

একচেটিয়া কারবার, ধনকুবের গোষ্ঠী, স্বাধীনতার বদলে শক্তিশালী জাতির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ছোট ছোট ও দুর্বল জাতির শোষণ — এইগুলি সাম্রাজ্যবাদের সেইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে, যা দেখে আমরা তাকে পরজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে বাধ্য।

...অর্থনৈতিক দিক থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদই হল সাম্রাজ্যবাদ। একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে হ'লে সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতেই হয় এবং তা শুধু দেশিয় বাজারেই (বিশেষ দেশের) নয়, বিশ্বজুড়ে বিদেশের বাজারেও ঘটাতে হবে। এই লগ্নিপুঁজির যুগে বিদেশি রাষ্ট্রের বাজারেও সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো কি অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে তোলা, তার কাঁচামালের উৎসগুলিকে দখল করা এবং এইভাবে তার সমস্ত শিল্পগুলিকে গ্রাস করার মধ্য দিয়েই তা করা হয়ে থাকে।

মার্কিন ট্রাস্টগুলিই সাম্রাজ্যবাদ অথবা একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে চিহ্নিত করছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তারা যে নানান কৌশল অবলম্বন করে তা শুধু অর্থনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ রাখে না — তারা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, এমনকী অপরাধমূলক অপকর্মের আশ্রয় নেয়। এই ট্রাস্টগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নানান কৌশল প্রয়োগ করে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে পারে না, এরকম ভাবা চূড়ান্ত ভুল হবে। এটা যে বাস্তবে সম্ভব তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্রাস্টগুলি ব্যাঙ্কসমূহ (ট্রাস্টের মালিকেরা শেয়ার কিনতে কিনতে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের মালিক হয়ে বসে) নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়োজিত পুঁজিকে ক্রমাগত দুর্বল করে। তাদের কাঁচামালের সরবরাহ কমিয়ে দেয়, (শেয়ার কেনার মাধ্যমে ট্রাস্ট মালিকেরা রেলপথের মালিক হয়ে বসে), কখনও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েও তারা সস্তায় পণ্য বিক্রি করে এবং শেষ পর্যন্ত তার শিল্পকারখানা, কাঁচামালের উৎস (খনি, জমি-জায়গা প্রভৃতি) কিনে নেয়।

এইভাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টগুলির ক্ষমতা এবং তাদের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বোঝা যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, কীভাবে তারা কারখানা, কাঁচামালের উৎস প্রভৃতি কিনে নেওয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পথেই নিজেদের সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে।

এক দেশের বৃহৎ লগ্নী-পুঁজি রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন অপর কোন দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিগুলোকে এইভাবে গ্রাস করে ফেলতে পারে এবং প্রতিনিয়ত তা করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভাবেই করা সম্ভব। রাজনৈতিকভাবে কোন দেশ অধিকার না করেও অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলা সম্ভব এবং তা ব্যাপকভাবে করা হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নানান পত্রপত্রিকায় প্রায় এ ধরনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, আর্জেন্টিনা বাস্তবে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক উপনিবেশ, বা পর্তুগাল বাস্তবে ব্রিটেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ইত্যাদি। বাস্তবত এগুলো তাই-ই। ব্রিটেনের কাছে ঋণ, ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, রেলপথ, খনি এবং জমিতে ব্রিটিশ মালিকানা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ না করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটেন এই দেশগুলোর উপর অধিকার কায়েম করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতাও খর্ব করতে চায়। তার কারণ হল, রাজনৈতিক দখলদারী থাকলে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার অধিকতর সহজ, সস্তা, বেশি সুবিধাজনক এবং অনায়াসলব্ধ হয়ে যায়। যেমন, সহজে উচ্চ পদাধিকারীদের ঘুষ দিয়ে কিনে নেওয়া, নানান সুযোগসুবিধা আদায় করা, সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করিয়ে নেওয়া প্রভৃতি। সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের বদলে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদ হ'ল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিংশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়েছে। পূর্বতন জাতীয় রাষ্ট্র — যা গড়ে না উঠলে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না — সেগুলি আজ আর পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদ কেন্দ্রীয়করণকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে ধনকুবেরদের সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট ও অ্যাসোসিয়েশন অধিকার করেছে এবং 'পুঁজির সম্রাটরা' হয় উপনিবেশ করে অথবা অন্যদেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের হাজার রকমের জালে আটকে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ...সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে পুঁজিবাদ ছিল জাতীয় মুক্তিদাতা, সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এখন জাতির সবচেয়ে বড় উৎপীড়কে পরিণত হয়েছে। আগে যে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, আজ সে প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ আজ উৎপাদিকা শক্তিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যে, উপনিবেশ সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবস্থা, নানা সুযোগ সুবিধা এবং জাতির উপর সমস্ত রকমের উৎপীড়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মানবসমাজকে হয় বছরের পর বছর, এমনকী কয়েক দশক ধরে 'বৃহৎ শক্তিগুলির' সশস্ত্র সংগ্রামের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নতুবা তারই বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।

শান্তি আজ আমেরিকান পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে একটা মস্ত বড় কবর

শিবদাস ঘোষ

... শান্তি আজ আমেরিকান পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে একটা মস্ত বড় কবর। কাজেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ তারা বাধাতে পারুক, বা নাই পারুক — এখানে-সেখানে আঞ্চলিক এবং আংশিক যুদ্ধ তাদের চাই-ই। কারণ ক্রমাগত সামরিক শক্তি তাদের বাড়াতে হবে। আর, এইভাবে সামরিক শক্তি এবং উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে তার স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে মাল খালাস করার জন্য মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ বা সংঘর্ষ (conflagration) তার দরকার। এখন, এই যুদ্ধ মানে কি শুধু বিশ্বযুদ্ধ? কেউ যুদ্ধবিরোধী — একথার মানে কি এই যে, সে শুধু বিশ্বযুদ্ধ চায় না? অপরের ঘর চড়াও হয়ে যে যুদ্ধ, বা এখানে-সেখানে যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ — সেটা কি কোন যুদ্ধ নয়? আমেরিকা যে অপরের ঘর চড়াও হয়ে ক্রমাগত এর বিরুদ্ধে তাকে, তার বিরুদ্ধে ওকে যুদ্ধে লাগিয়ে দিচ্ছে, ওকে তার খবর পরিবেশন করছে, আবার তাকে গিয়ে ওর খবর বলে দিচ্ছে এবং তার দ্বারা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করে দিচ্ছে — এগুলি কি যুদ্ধ নয়? ... সমস্ত দুনিয়াজোড়া আন্তর্জাতিক গুপ্ত সংস্থার দ্বারা তারা এইভাবে কাজ করে চলেছে।

গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। কেন করেছে, এ ব্যাপারে তার উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার ছিল, মুখে সে যাই বলুক না কেন। পাকিস্তানের 'কাশ্মীর চাই' — এই দাবির পিছনে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে, উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে সে সবই করেছে। বাস্তবে আমেরিকা এবং বৃটিশ 'লবি'র পরামর্শে এবং সাহায্যেই পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকেছে, আবার পাকিস্তান থেকে এই যে অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকেছে, সিআইএ আবার গোপনে সে খবর ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তোমাদের দেশে কিন্তু অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে। অর্থাৎ দু'পক্ষকেই বলছে, ভালো করে লাগো। পাকিস্তানকে বলছে, ভারতে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আবার আজাদ কাশ্মীরের প্রশ্ন ইউএনও-তে তুলতে, নাহলে সে কিছু করতে পারবে না। আবার ভারতবর্ষে এসে বলছে যে, অনুপ্রবেশকারী কিন্তু ঢুকছে। খবরে জানা যায়, পাকিস্তানের এই অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর সংবাদ সিআইএ-ই প্রথমে এসে ভারতবর্ষকে দিয়েছে। এইভাবে আমেরিকা পিছন থেকে দু'দেশের লড়াইয়েরই কলকাঠি নেড়েছে। আমরা সে জায়গায় কি করেছি না করেছি, সেগুলো অন্য আলোচনা। আমি এই উদাহরণটা দিয়ে শুধু দেখাতে চাইলাম যে, আমেরিকার এই রাজনীতির ধরনটা কী।

... আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ, ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ আমেরিকা আজ দস্যুর দেশে পর্যবসিত। এমন ঘৃণ্য কাজ নেই, যা সে করে না। নাৎসিরা যুদ্ধাপরাধী বলে নিন্দিতই হয়েছে। আমেরিকা আজ ভিয়েতনামে যা করছে এবং দুনিয়ার আরও বহু দেশে যা করে বেড়াচ্ছে, তা নাৎসিদেরও লজ্জা দেয়। 'গেস্টাপো' কার্যকলাপ এবং পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপকে মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য চক্রান্ত বলা হয়েছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই সিআইএ এবং এফবিআই কী করে বেড়াচ্ছে? হেন দুষ্কর্ম নেই যা এরা করে বেড়াচ্ছে না। রাজনৈতিক খুন সংগঠিত করা, আভ্যন্তরীণ 'ক্যুপ' সংগঠিত করা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ঘৃণ্য কার্যকলাপই এরা দুনিয়া জুড়ে করে বেড়াচ্ছে। তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের একটাই উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে, দুনিয়ায় এখানে সেখানে সর্বত্র যুদ্ধবিগ্রহের মনোভাব জিইয়ে রাখা, খণ্ড যুদ্ধ সৃষ্টি করা, একের বিরুদ্ধে অপরকে যুদ্ধে লিপ্ত করা — যাতে যেসব প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো ক্রমাগত তার কাছে গুদামজাত হয়ে জমে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে, অপরদেশে পাচার করার দ্বারা সে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলোর একটা গতি হয়। ফলে, এভাবে যত লড়ালড়ি চলতে থাকবে, ততই তাদের লাভ।

...যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে, যুদ্ধবাজরা (war maniacs) আছে, সামরিক শাসনব্যবস্থা আছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো চলছে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বাস্তব সম্ভাবনা বর্তমান, সেখানে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকছে।... বিপ্লবীদের কাছে 'যুদ্ধ চাই না' কথাটার অর্থ হল, এমন একটা বাস্তব রাজনীতি এবং কর্মপন্থার অনুসরণ, যে রাজনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণের ফলে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ লাগাবার উপকরণগুলো এবং আয়োজনগুলোই বানচাল হয়ে যাবে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলো জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকবে। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাতে চালাতেই সাম্রাজ্যবাদ দেখবে যে পূর্বে সে যতটুকু প্রস্তুত ছিল, তার চেয়ে আরও খারাপ অবস্থার মধ্যে সে পড়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদকে এমন একটা অবস্থায় ফেলতে হবে — যাতে সে শুধু একটা পর একটা পরিকল্পনা করতে থাকবে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনগুলো জয়যুক্ত হয়ে যাবে — এ ধরনের বাস্তব রাজনীতি গ্রহণ করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে চেষ্টা করতে থাকবে একে 'ম্যানেজ' (হাত করা) করা, তাকে 'ম্যানেজ' করা, এখানে ফাঁক পূরণ করা, ওখানে ফাঁক পূরণ করা, অন্যদিকে দেখবে যে কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে — একদিকে 'ম্যানেজ' করতে করতে অন্যদিকে ফাটল ধরে গেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে এদেশ বেরিয়ে গেছে, ঐ দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে, সেদেশ তাদের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে, অর্থনৈতিক সঙ্কট চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। এইভাবে নানা দিক থেকে সমস্ত আন্দোলনগুলোকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে এমন দুর্বল করে দেওয়া, যাতে যুদ্ধ বাধাবার তাদের সমস্ত চক্রান্তটাই বানচাল হয়ে যায়।

...একটার পর একটা দেশে বিপ্লব ঘটানোর দ্বারা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে এমনভাবে কোণঠাসা করা, যাতে যুদ্ধ লাগানোর পরিকল্পনা করতে করতেই সে খতম হয়ে যায়। এই হল যুদ্ধের হাত থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার বাস্তব রাস্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় এই বাস্তব পরিস্থিতির — অর্থাৎ যুদ্ধ লাগাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে করতেই দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে খতম করে দিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত কাজগুলো সবটা যদি নাও করা যায়, অন্তত কতকগুলো পুঁজিবাদী দেশকে সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর দ্বারা, সেই সংগ্রামগুলির সফলতার দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে ফেলা, যে পরিবেষ্টনের দ্বারা সে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যাতে তার আর যুদ্ধ লাগাবার ক্ষমতা না থাকে — এমন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটাই হল যুদ্ধ বন্ধ করার বাস্তব পন্থা। অথচ, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব নিলেন উপোস এবং আবেদন-নিবেদনের রাস্তা, কতকগুলো শুকনো, মেকি কথা যা শয়তান বা বাঘ শোনে না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে হাড়ে হাড়ে শয়তান। আর, মনে রাখা দরকার, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় কোন একজন শাসক ব্যক্তিগতভাবে যদি শয়তান নাও হয়, তবু যুদ্ধের আয়োজন করা ছাড়া

পাঁচের পাতায় দেখুন

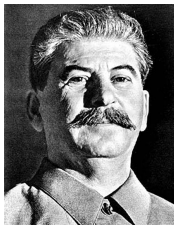

সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প রাখেনি

জে ভি স্ট্যালিন

লেনিনবাদ গড়ে উঠেছে ও সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থার মধ্যে — যখন পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে, শ্রমিকবিপ্লব আশু বাস্তব হিসাবে দেখা দিয়েছে, বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির পুরোনো যুগের বদলে পুঁজিবাদের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার মত নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বলেছেন, 'মুমূর্ষু পুঁজিবাদ'। কেন একথা বলেছেন? কারণ, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে শেষ সীমায় নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয় চূড়ান্ত পর্যায়ে, যার পরের স্তরেই সূচনা ঘটে বিপ্লবের। এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দ্বন্দ্ব হল, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশগুলির একচেটিয়া ট্রাস্ট আর সিন্ডিকেট, ব্যাঙ্ক আর ধনকুবের গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তৃত্ব। এই সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের যেসব প্রচলিত পদ্ধতি — যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান, পার্লামেন্টারি দল ও পার্লামেন্টের মধ্যে সংগ্রাম — এগুলি সবই পুরোপুরি অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। হয় পুঁজির দয়ার উপর নিজেকে সঁপে দাও, আগের মতোই দুর্দশার মধ্যে বেঁচে থাক এবং ক্রমাগত আরও নীচে নামতে থাক, অথবা লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার তুলে নাও — এই বিকল্পই বিশাল শ্রমিক জনসাধারণের সামনে সাম্রাজ্যবাদ তুলে ধরেছে। সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর সামনে বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন বিকল্প রাখেনি।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব হল, বিশ্বে কাঁচামালের উৎসগুলি এবং বিদেশের ভূখণ্ড ইত্যাদি দখল করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত নানা ধনকুবের গোষ্ঠীর (ফিনানসিয়াল অলিগার্কি) মধ্যে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল, কাঁচামালের দেশে পুঁজি রপ্তানি করা, কাঁচামালের উৎসগুলোর উপর একচেটে অধিকার কায়েম করার জন্য মরিয়া লড়াই চালানো এবং যে দুনিয়া ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় ভাগাভাগি করার জন্য সংঘর্ষ করা, পুরোনো ধনকুবের গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যারা নিজেদের অধিকৃত এলাকাগুলো প্রাণপণে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে নব-উত্থিত ধনকুবের গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বেপরোয়া লড়াই, যেটা তারা বিশ্বে ''প্রাণধারণের জায়গা পাওয়ার'' নাম করে চালায়। বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই বেপরোয়া সংঘর্ষের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ — বিদেশের ভূখণ্ড দখল করার জন্য যুদ্ধ এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর পরিণামে, আবার সাম্রাজ্যবাদীরাই একে অপরকে দুর্বল করে দেয়, সাধারণভাবে পুঁজিপতিদের অবস্থানই দুর্বল হয়ে পড়ে, সর্বহারা বিপ্লব দ্রুততর হয়, বাস্তবেই বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয় দ্বন্দ্ব হল, মুষ্টিমেয় কয়েকটি 'সভ্য' শাসক রাষ্ট্র, আর দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশের জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হল উপনিবেশ এবং নির্ভরশীল দেশগুলির কোটি কোটি জনসাধারণের উপর অমানুষিক পীড়ন, নগ্নতম শোষণ চালাবার ব্যবস্থা। এই শোষণ আর অত্যাচারের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে নিঙড়ে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করা। কিন্তু এইসব দেশগুলোকে শোষণ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সেখানে রেলপথ এবং কলকারখানা গড়ে তুলতে এবং শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। এই 'নীতি'র অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আবির্ভাব ঘটে এক শ্রমিকশ্রেণীর, অভ্যুদয় হয় দেশিয় বুদ্ধিজীবীদের, জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে, শোষণমুক্তির আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি উপনিবেশে, প্রত্যেকটি নির্ভরশীল দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিই পরিষ্কারভাবে একথার সত্যতা প্রমাণ করছে। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর ফলে উপনিবেশ এবং নির্ভরশীল দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের মজুতবাহিনী থেকে শ্রমিক বিপ্লবের মজুতবাহিনীতে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে পুঁজিবাদের ভিত্তিতে বিরাট আঘাত লাগে।

সাধারণভাবে এইগুলোই হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ, যা পুরোনো 'বিকাশমান' পুঁজিবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদে পরিণত করেছে।

দশ বছর আগে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম তাৎপর্য হল এই যে, পুঁজিবাদের সমস্ত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তা একসূত্রে গ্রথিত করে সংকটকে আরও তীব্রতর করেছিল এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী লড়াইয়েরই গতিবৃদ্ধি করেছিল, বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। এককথায় বলা চলে যে, সাম্রাজ্যবাদ শুধু বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবীই করে তোলেনি — পুঁজিবাদের দুর্গে সরাসরি আঘাত হানবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাজনক অবস্থারই সৃষ্টি করেছে।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই লেনিনবাদের জন্ম দিয়েছিল।

(দি হিস্‌টরিক্যাল রুটস্ অফ লেনিনিজম্' — প্রবলেমস্ অফ লেনিনিজম বই থেকে উদ্ধৃত)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাগুজে বাঘ

মাও সে তুঙ

...সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। বৃহৎ অবক্ষয়িত শক্তিগুলি পথ ছেড়ে দেবে ক্ষুদ্র নবজাত শক্তিগুলিকে। ক্ষুদ্র শক্তিগুলি বৃহৎ শক্তিতে পরিবর্তিত হবে, কারণ জনগণের অধিকাংশই এই পরিবর্তন চায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হবে, কারণ মার্কিন জনগণও তাদের সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। ...

...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিধর ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। রাজনৈতিকভাবে সে খুবই দুর্বল, কারণ বিপুল জনগণ থেকে সে বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকে, এমনকী মার্কিন জনগণও তাকে চায় না। আপাতদৃষ্টিতে একে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে হলেও বাস্তবে একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এ একটা কাগুজে বাঘ। দৃশ্যত এ একটা বাঘ, (কিন্তু) কাগজের তৈরি, ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছু নয়।

মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস, হাজার হাজার বছরের শ্রেণীসমাজের (class society) ইতিহাস এই সত্য প্রমাণ করেছে, শক্তিমানকে দুর্বলের কাছে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। একথা আমেরিকার ক্ষেত্রেও সত্য।

সাম্রাজ্যবাদ যখন অবলুপ্ত হবে, একমাত্র তখনই শান্তি বিরাজ করতে পারে। একদিন আসবে যখন কাগুজে বাঘেরা মুছে যাবে। কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় অবলুপ্ত হবে না, ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে তাদের পর্যুদস্ত করতে হবে।

...আমরা যখন বলি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হল একটা কাগুজে বাঘ, তখন আমরা রণনীতিগতভাবেই তা বলি। সামগ্রিকভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখা উচিৎ। কিন্তু আলাদা করে এর প্রতিটি অঙ্গকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এর নখ-দন্ত রয়েছে। প্রতিটি অঙ্গ ধরে ধরে একে আমাদের ধ্বংস করতে হবে। ...আমরা যদি আন্তরিকভাবে ধাপে ধাপে এর মোকাবিলা করি, তবে শেষে আমরা নিশ্চিতভাবে সফল হব।

...রণনীতিগতভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আমরা চরম ঘৃণা করব। রণকৌশলের দিক থেকে অবশ্যই আমাদের একে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে প্রতিটি যুদ্ধ, প্রতিটি লড়াইকেই আমাদের গুরুত্ব দিয়ে লড়তে হবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিধর, কিন্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এর কোনও জনসমর্থন নেই, এর নীতিগুলি জনগণের অপছন্দের, কারণ এগুলি জনগণকে নিপীড়ন করে, শোষণ করে। এই কারণেই এই বাঘ ধ্বংস হবে। অতএব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয় এবং একে ঘৃণা করা উচিৎ। তবে এখনও সে শক্তিধর, ...যেজন্য তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং একটার পর একটা ক্ষেত্রে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে এবং সেজন্য সময় লাগবে।

সাম্রাজ্যবাদ কোন্ কাজে লাগে? চীনের মানুষের কাছে এর কোনও প্রয়োজন নেই, অবশিষ্ট বিশ্ববাসীর কাছেও এ অপ্রয়োজনীয়। সাম্রাজ্যবাদের টিকে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

(জুলাই ১৪, ১৯৫৬, রচনাবলী, ৫ম খণ্ড)

শান্তি আমেরিকান অর্থনীতির পক্ষে কবর

চারের পাতার পর

তার উপায় নেই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি তাকে সেদিকে ঠেলে দেয়। এখানে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকটি ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন অবান্তর। একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে ভাল হতে পারে, সৎ হতে পারে। কিন্তু, সে ঐ শাসনব্যবস্থা ভালভাবে চালাতে পারবে না। সামরিক অধিনায়করা, বা তার দেশের যুদ্ধবাজরা, অর্থাৎ বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাকে পছন্দ করবে না, যদি সে যুদ্ধ অর্থনীতিকে মদত না দেয়, 'ওয়ার ইকনমিকে বুস্ট' না করে। সে মানবিক বলে, 'ফ্লেক্সিবল্' বলে, রাজনীতিতে যে নীতিই গ্রহণ করুক, যদি অর্থনীতিকে মূলত যুদ্ধ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে তারা তাকে ফেলে দেবে। কারণ, আসল ক্ষমতাটা তারাই কন্ট্রোল করছে। এখানে কোন ব্যক্তিকে পরোয়া করলে তাদের চলে না। ফলে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে একজন শাসক যদি ভালো, মানবিক গুণের অধিকারীও হয়, তাতে কি হবে? এই ব্যবস্থায় সে নিরুপায়, তার কোন ক্ষমতাই নেই। হয় তাকে এই ব্যবস্থার সেবা করতে হবে, আর তা যদি সে না করতে পারে, তবে তাকে ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্যিকারের ক্ষমতাটা যারা কন্ট্রোল করে, তারা তাকে সহ্য করবে না। তাকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেবে। হয়ত আর একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু সে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা যে রাস্তায় যাবার সে রাস্তায়ই যাবে।...

[নভেম্বর বিপ্লব ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি বই থেকে উদ্ধৃত]

...যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয় — লেনিনের এই সিদ্ধান্ত আজ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, তা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ আজ আর আগের মত একটি সর্বব্যাপ্ত বিশ্বব্যবস্থা (all embracing world system) হিসাবে বিরাজ না করলেও এবং পূর্বের তুলনায় প্রভূত পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়লেও, সাম্রাজ্যবাদী যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে লেনিনের ব্যাখ্যাগুলির সঠিক উপলব্ধি থাকলে এবং শান্তির পক্ষে প্রভূত শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা অভিভূত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান লোপ না পেলে একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ আপনাআপনি নিজে থেকে ধ্বসে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদের আর আঘাত করার বা যুদ্ধ বাধাবার শক্তি বর্তমানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে আজ একটি বিশ্বব্যবস্থা (world system) হিসাবে টিকে আছে তাই নয়, তা আজও কার্যকরী শক্তি নিয়ে অবস্থান করছে। সবদিক থেকে কোণঠাসা হওয়ার ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে অর্থনীতির যত সামরিকীকরণ করা হচ্ছে, তত সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের ঝোঁকও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অস্ত্র সজ্জা ও সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অতীত রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘিরে আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি সর্বদাই যেকোন মুহূর্তে আক্রমণ করবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার জার্মান প্রতিহিংসাবাদকে জাগিয়ে তুলেছে। জাপানে সামরিকবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়েছে। যদিও পরিস্থিতির চাপে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরোনো ঔপনিবেশিক নীতি কিছুটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তাদের আগ্রাসী নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তারা ঘটায়নি। দুর্বল ও পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে,

সাতের পাতায় দেখুন

ভয়াবহ আর্থিক অবরোধ সত্ত্বেও কিউবা নতিস্বীকার করেনি

আব্রাহাম লিঙ্কনের আমেরিকা আজ দেশে দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসীরূপ পরিগ্রহ করে গোটা বিশ্বকে তার পদতলে আনতে চাইছে। যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্বকে আমেরিকা সহ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পায়ে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করছে মার্কিন শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন সহ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক সমস্ত লেনদেন বন্ধ করে দিচ্ছে। কিউবার বুকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া মেনে নিতে পারেনি। তাই দুনিয়ার বুক থেকে 'সমাজতন্ত্রকে উৎখাত কর', 'কিউবাকে ধ্বংস কর' এটাই আমেরিকার বিদেশনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমস্ত বেচা-কেনা বন্ধ করে দিয়ে কিউবাকে ভাতে মারার যে ষড়যন্ত্র করেছে আমেরিকা, তা যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

১৯৫৯ সালে যখন কিউবায় বিপ্লব ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের সূচনা হয় সেই সময় আমেরিকা বলেছিল নতুন সরকার অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে পারবেনা। বলতে গেলে তখন থেকেই পরোক্ষভাবে কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধ শুরু। অবরোধ পাকাপোক্তভাবে শুরু হয় ১৯৬২ সালে। সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন. এফ. কেনেডি। তিনি কিউবা থেকে সিগারেট এবং মদ আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুরু হয় কিউবার অর্থনৈতিক সঙ্কট। তারপর নানাভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও কিউবা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে থাকে। কিউবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ৮৫ শতাংশই ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে। কিন্তু নব্বই-এর দশকের সূচনায় পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলে কিউবা ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যায়। সুযোগ পেয়ে যায় আমেরিকা। কিউবার অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্য মার্কিন প্রশাসন ১৯৯২ সালে কুখ্যাত টরিসেলি আইন প্রয়োগ করে। কিউবার বন্দরে জাহাজ ব্যবসায় কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বলা হয়, কোন তৃতীয় দেশের জাহাজ যদি কিউবার বন্দরে ৬ মাস যাতায়াত করে, তাহলে তাকে আমেরিকার বন্দরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য, আমেরিকার মত একটি শক্তিধর রাষ্ট্রের এহেন হুমকিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশগুলিও তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আমেরিকার চাপে কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে থাকে। আক্রমণ এখানেই থেমে থাকেনি। ১৯৯৬ সালে মার্কিন কংগ্রেস হেল্‌ম্‌স্‌-বার্টন আইন পাশ করে কিউবার বুকে বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিউবা যাতে 'তৃতীয় বিশ্বের' আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত কোম্পানিগুলি থেকেও জীবনদায়ী ওষুধ এবং খাদ্য কিনতে না পারে তারজন্যও আইন পাশ করা হয়। যে আমেরিকা শিশু শ্রমকে 'অমানবিক' আখ্যা দিয়ে মানবিকতার মুখোশ পড়ে, সেই আমেরিকা কিউবার শিশুদের জন্য ক্যান্সার প্রতিষেধক কেনায়ও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মানবতার প্রতি কী নিদারুণ কশাইবৃত্তি থাকলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিউবার জীবনদায়ী ওষুধ যা আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশে বিক্রি হত সেটাও ওয়াশিংটন বন্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকা ঘোষণা করেছে, কিউবা থেকে কাঁচামাল কিনে কোন দেশই যেমন আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবেনা, তেমনি আমেরিকান প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপন্ন পণ্য কোন দেশই কিউবায় বিক্রি করতে পারবে না। করলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃতীয় দেশগুলিকেও (third countries) নিষেধ করা হয়েছে তাদের ব্যাঙ্কে যাতে কোন কিউবার নাগরিক ডলারের 'অ্যাকাউন্ট' খুলতে না পারে অথবা মার্কিন মুদ্রায় কিউবার কোম্পানিগুলির সঙ্গে যাতে লেনদেন না করা হয়। এবছর কিউবার একটি কোম্পানির সঙ্গে লেনদেনের অভিযোগে সুইজারল্যান্ডের ইউ বি সি ব্যাঙ্ককে ১০০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হয়েছে। বহির্বিশ্ব থেকে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করে

আটের পাতায় দেখুন

সাদ্দাম হুসেনের বিচার প্রহসন

গণহত্যাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের সামরিক মহড়া বন্ধ কর

তিনের পাতার পর

মার্কিন মদতপুষ্ট সেনাবাহিনী ১৯৬৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল সন্দেহে যে গণহত্যা চালায়, যার শিকারে পরিণত হন ৫ থেকে ১০ লক্ষ মানুষ, ভয়াবহতায় তার তো কোনও জুড়ি মেলাই ভার! এমনকী নিউইয়র্ক টাইমস্‌ও (১২ মার্চ, ১৯৬৬) এই ঘটনাকে 'আধুনিককালের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বর্বর গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করে (সূত্র ঃ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঃ মাইকেল প্যারেন্টি)।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরতার ইতিহাস কিন্তু মোটেই কোনও সুদূর অতীতের বিষয় নয়, একেবারে সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসও তাদের এই বর্বর পদক্ষেপের অভিঘাতে বিদীর্ণ, ছিন্নভিন্ন। যেখানেই মানুষ সংগঠিত হয়েছে, রুখে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের একতরফা শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে, সেখানেই তাদের উপর নেমে এসেছে জিঘাংসায় পূর্ণ হিংস্র আঘাত — কোথাও সরাসরি, কোথাও বা সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের বসানো পুতুল সরকারের বকলমে। যেমন দেখি আমরা ১৯৮০ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার কোয়াংজু শহরে। সেখানকার চোনান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮ মে মার্কিন মদতপুষ্ট দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন সামরিক প্রশাসক জেনারেল পার্ক চুং হি-র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। শহরের মানুষও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ায় ও গোটা শহর কার্যত আন্দোলনকারীদের দখলে চলে যায়। কিন্তু ২৭ মে সেখানে অবস্থানকারী মার্কিন বাহিনীর গ্রিন ক্যারেট ফোর্সের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয় বাহিনী এই নিরস্ত্র আন্দোলন দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যথেচ্ছ গুলি চালাতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীদের সরাসরি হত্যা করতে তারা হেলিকপ্টার থেকে নাপাম বোমাও বর্ষণ করে। ফলে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষক নিহত হন। (তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্কাস ওয়ার্ল্ড, ৫ মে ২০০২)। মেক্সিকোর বুকে উনামেও ২০০০ সালে প্রায় এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও ফি- বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ন্যাশনাল অটোনমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকো (উনাম)-এর ছাত্ররা ১৯৯৯ সালের জুন মাসে আন্দোলন শুরু করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দখল করে নিয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। নানারকম প্রলোভন, হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন, সবকিছুকেই উপেক্ষা করে এই আন্দোলন ৯ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে এবং মাথা নোয়াতে রাজি না হলে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলনকে দমন করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করতে মেক্সিকোর সেনাবাহিনী এবং মার্কিন বাহিনী হঠাৎ এক ঝটিকা আক্রমণ শুরু করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উপর দিয়ে হেলিকপ্টার গানশিপ চালিয়ে দেয়। সেসময় ছিল রাত্রি। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ছিলেন নিদ্রাচ্ছন্ন। ফলে ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁরা গুলিতে সম্পূর্ণ ঝাঁঝরা হয়ে যান এবং একে একে মোট ১৫০০ ছাত্রছাত্রী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। (তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্কাস ওয়ার্ল্ড, ১৭-২-২০০০ ও ফ্রন্টলাইন ৩-৩-২০০০) ঠিক একইরকম ঘটনার সাক্ষী মধ্য আমেরিকার ছোট্ট দেশ নিকারাগুয়া ও হন্ডুরাস। নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা সরকারকে উৎখাত করার জন্য কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সহায়ক শক্তি হিসাবে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ হন্ডুরাস-নিকারাগুয়া সীমান্তে একটি বিমান ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা করে। তার জন্য ইলাপাগো (হন্ডুরাস) নামক একটি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়। সেখানকার গ্রামের চাষীদের খেতের ফসল প্রথমে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা শুরু হলে গ্রামবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই বাধা দেন। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ হঠাতে মার্কিন সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ২৫০০ জন নিরস্ত্র চাষী নিহত হন এবং বাকিদের টেনে হিঁচড়ে কন্ট্রাদের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। (সূত্র ঃ কালচার অফ টেররিজম, নোয়াম চমস্কি)

এই যাদের ইতিহাস, তারাই আজ গণতন্ত্রের মুখোশ পরে বিচার করতে চায় সাদ্দাম হুসেনের। একটি দেশের স্বাধীনতা হরণ করে, সাংবিধানিকভাবে বৈধ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বিচার করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের পর বিশ্বের সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যার নায়ক হানাদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাদের কদর্য নৃশংসতাকে তারা যতই কপটতার আড়ালে ঢেকে রাখার চেষ্টা করুক, বিশ্বের আপামর শান্তিপ্রিয় যুদ্ধবিরোধী জনসাধারণ কিন্তু চিনে ফেলেছে তাদের স্বরূপকে। যতই তারা সাদ্দাম হুসেনকে বানাতে চাক যুদ্ধাপরাধী, আসল যুদ্ধাপরাধী বলে মানুষের সামনে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে বুশ ও ব্লেয়ার এবং তাদের পারিষদবর্গ।

৩০ মার্চ, ২০০৩ ঃ কলকাতায় কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করছেন অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ দেখেছে তাদের নির্লজ্জ নৃশংস ইরাক আক্রমণ, বা আক্রমণ চলাকালীন ইরাকিদের হাতে ধরা পড়া মার্কিন সৈন্যদের উপরে ইরাকিদের 'অত্যাচারের আশঙ্কায়' ইঙ্গ-মার্কিন গণমাধ্যমের তীব্র চিৎকার ও মড়াকান্না। অথচ সপ্তাহ কয়েক বাদে ঐ বন্দী মার্কিন সেনারা যখন মুক্ত হল, দেখা গেল ইরাকিরা তাদের জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের যা যা সুবিধা পাওয়ার কথা, তার সবই দিয়েছিল, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল এবং এমনকী আহতদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিল। আর বিপরীতে আমেরিকানদের হাতে বন্দী ইরাকিদের হাল? উদাহরণ আবু ঘ্রাইব বা কিউবার উপকূলস্থ মার্কিন কয়েদখানা গুয়ান্তানামো বে। সেখানে ভুলেও কেউ জেনিভা চুক্তির উল্লেখও করে না। হাত-পা বাঁধা উলঙ্গ অবস্থায় জন্তুর থেকেও অধম জীবনযাপনে বাধ্য হয় সেখানে বন্দীরা। আর তাই নিয়ে হই চই শুরু হলে বড়জোর এক আধজন সৈন্যকে হালকা সামান্য শাস্তি দিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এই যার নিজের ইতিহাস, সাদ্দাম হুসেনকে বিচার করার কোনও অধিকার তার আছে কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা এই গণহত্যার ইতিহাস একটি মূল সত্যকে স্পষ্ট করে দেয় — রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পররাজ্যে হানাদারি, অপরের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করা, লুঠ ইত্যাদি কোন কিছুই কোনও একজন বা কয়েকজন বিশেষ মার্কিন শাসকের খেয়ালখুশি অথবা তাদের বিশেষ অত্যাচারী চরিত্রের বা নীতির পরিণাম নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে যেই বসুক, বাইরের আবরণে কিছু রকমফের ছাড়া শাসনের, শাসনব্যবস্থার, অর্থনীতির মূল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তাতে বদলায় না। অর্থাৎ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ যে আগ্রাসী, অত্যাচারী, লুঠেরা ভূমিকা গোটা বিশ্ব দেখছে, সেটা প্রেসিডেন্ট বুশের মতো শয়তান প্রেসিডেন্টের জন্য ঘটছে তা নয়, এর শিকড় রয়েছে মার্কিন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই। জর্জ বুশ যখন ছিল না, তখনও সাম্রাজ্যবাদ যা ছিল, ভবিষ্যতে যখন বুশ থাকবে না, তখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই রূপটাই দেখা যাবে, যদি না ইতিমধ্যে তাকে কোণঠাসা করা যায়। আর পৃথিবীকে যদি মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, তবে কবরে পাঠাতে হবে সাম্রাজ্যবাদকে।

আশার কথা, দীর্ঘকাল ঘুমন্ত থাকার পর দেশে দেশে জনগণের বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠছে। খোদ আমেরিকার জনগণ লাখে লাখে রাস্তায় নামছে। ল্যাটিন আমেরিকা গণবিক্ষোভে উত্তাল। জর্জ বুশকে ফিরে যেতে হয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে। বিক্ষোভ চলছে দক্ষিণ কোরিয়ায় — অ্যাপেক গোষ্ঠীর বৈঠককে কেন্দ্র করে। লজ্জার কথা, এই অবস্থায় ভারতের পুঁজিবাদী শাসকচক্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনী, যার বিরুদ্ধে দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী জনগণ লড়ছে, তাদের ভারতে ডেকে এনে যৌথ সামরিক মহড়া দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে গর্জে উঠতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের দেখানো পথে গড়ে তুলতে হবে ব্যারিকেড। এই লক্ষ্যেই ২৪ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন।

সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার ‘অখণ্ড বিশ্ববাদ’

ই. দুনায়েভা

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদকে (Cosmopolitanism) হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। পুঁজিবাদের যুগের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের লোভাতুর রাক্ষসেরা দেশে দেশে ঢুকে মুনাফা হাতাবার ও জনগণকে শোষণের জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদের মুখোশ পরত। গোটা পৃথিবীতে দরদী বিশ্ব নাগরিক সেজে তারা প্রকাশ্যভাবেই বলে বেড়াতে লাগল যে টাকার কোন মাতৃভূমি নেই, পুঁজি যেখানেই খাটান হোক সেটাই হল বুর্জোয়াদের নিজের দেশ। পুঁজিবাদ যতই এগিয়ে গেল, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের যুগে যখন বড় বড় ধনকুবেররা নিজেদের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে, পণ্য এবং মূলধন খাটাবার নতুন নতুন বাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে আন্দোলন চালাতে লাগল তখন ‘অখণ্ড বিশ্ববাদ’ হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা।

লেনিন লিখেছেন, ‘‘সাম্রাজ্যবাদের মানেই হল পুঁজি জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে; এর মানেই হল এক নতুন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে জাতীয় শোষণের প্রসার এবং তীব্রতা বৃদ্ধি।’’

আজকের দিনেও ‘অখণ্ড বিশ্ববাদ’ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার আদর্শবাদী মন্ত্র। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অখণ্ড বিশ্ববাদের বিষ ছড়াচ্ছে চারিদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতিগুলিকে আদর্শভ্রষ্ট করার জন্য, দেশকে উপেক্ষা করতে শেখানোর জন্য, জাতীয় ‘নিহিলিজম’ সৃষ্টি করে তাদের সজাগ প্রহরাকে দুর্বল করার জন্য।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির অভিভাবক সাজবার চেষ্টা করছে। গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের বুলি আউড়ে তারা গোটা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, বহুকালের দেশগুলিকে অধীন করে উপনিবেশে বানাতে চাইছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৈয়ায়িকেরা বলে যে, জাতি, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি কথা আমাদের যুগে অচল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাঁদের শর্তে আমাদের এক ‘অখণ্ড বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের’ স্বার্থে স্বেচ্ছায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অখণ্ড বিশ্ববাদ, বিশ্বরাষ্ট্র, এগুলো আসলে বর্বর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আত্মগোপনের পর্দা। এক ‘বিশ্ব কমনওয়েলথ’ সৃষ্টির কথা বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে যে, এই কমনওয়েলথ তাদেরই নেতৃত্বে হওয়া চাই। হিটলারীদের মত এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদের উঁচু জাতি হিসাবে জাহির করছে। লিঞ্চ আইন, ক্লু-ক্লাক্স-ক্লীন ধরনের মার্কিন জীবনযাত্রা প্রণালীকে তারা অনুসরণীয় বলে প্রচার করছে, আদর্শ ‘গণতন্ত্র’ বলে জাহির করেছে। অন্য জাতির ওপর এই আদর্শ তারা চাপাতে চায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অখণ্ড বিশ্ববাদ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ।

অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেও বুর্জোয়াশ্রেণী অনেক ক্ষেত্রে অখণ্ড বিশ্ববাদের সমর্থক। যেসব দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সংহত করার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে পারে, সেইসব দেশেই অখণ্ড বিশ্ববাদের প্রচার চলতে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি এবং অন্যান্য দেশগুলির সরকারদের মার্শালীকরণ মেনে নেওয়া এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তিতে যোগ দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রের সঙ্গে দেশকে বেঁধে দেওয়াই হল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জন্য আজ এই দেশগুলির জনগণের দুর্দশার সীমা নেই।

পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী, নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি এবং উপনিবেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের আঘাতে অসহায় বোধ করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার আশায় তারা দেশবাসীর বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। মার্কিন পুঁজির আক্রমণের সামনে তারা নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দরজা খুলে দিয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত বান্দা দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা অখণ্ড বিশ্ববাদের উৎসাহী প্রচারক। ‘সকলের মঙ্গলের জন্য সহযোগিতার’ ধুয়ো তুলে ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, ইতালির, বেলজিয়ামের এবং অন্যান্য দেশের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা তাদের সাগরপারের প্রভুদের পশ্চিম ইউরোপকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বানাতে সাহায্য করেছে। লেবার পার্টির মিঃ লাস্কি বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার ওকালতি করে মন্তব্য করেন যে, যতদিন জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি বজায় থাকবে ততদিন পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে না। বেভিন ও ম্যাকনীল জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ‘সেকেলে’, ‘অচল’ ইত্যাদি বিশেষণ দিয়েছেন। বেলজিয়ামের মিঃ স্পাকও তাই বলেছেন। ইউরোপে আমেরিকার বিশেষ প্রতিনিধি হ্যারিম্যান ইউরোপের সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসাবে গণ্য করেছেন। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী বান্দাদের বিরুদ্ধে হ্যারিম্যানের এই উক্তিই হল অকাট্য প্রমাণ।

একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলি প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির নেতৃত্ব নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কঠোর আন্দোলন চালাচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারীরা বেশ বোঝেন যে, তাঁদের আক্রমণাত্মক পথের প্রধান বাধা হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছোট বড় সমস্ত জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে, যুদ্ধবাদীদের মুখোশ খুলে ধরে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তির প্রহরী।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল অখণ্ড বিশ্ববাদের (ছদ্মবেশ পরা

আটের পাতায় দেখুন

বিশ্বের দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দক্ষিণ কোরিয়া *জার্মানি* *আমেরিকা* *মেক্সিকো* *এল সালভাদোর*

শান্তি আমেরিকান অর্থনীতির পক্ষে কবর

পাঁচের পাতার পর

সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত আজও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটার (quantitative change leads to qualitative change) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি থাকলে একথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, একটি ফেনোমেনন-এর (বিষয় বা সত্তার) অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী শক্তিসমাবেশের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন যে পরিমাণেই সাধিত হোক না কেন, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মারফৎ সেই বিশেষ ফেনোমেননটির জায়গায় নতুন একটি ফেনোমেনন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে ফেনোমেননটির গুণগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সেই ফেনোমেননটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার আভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তিগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় না। কাজেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাত্রেরই জানা উচিত, প্রতিটি যুগের (epoch) বিকাশের প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। কিন্তু এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতদিন না পুরানো যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি সম্পূর্ণ নূতন যুগের আবির্ভাব ঘটে।

বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যদি সাধারণভাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ আর পূর্বের ন্যায় অনিবার্য নয়, তবে সেটা এক জিনিস এবং এভাবে বলা ভালও বটে; কিন্তু একথার সাথে যদি ‘সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত অকার্যকরী হয়ে গেছে’— এই ভ্রান্ত ধারণা মিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। বিশ্বের সামাজিক শক্তিগুলির মেরুকরণের ফলে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী যুদ্ধশিবির এবং সোভিয়েট ও চীনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রধান নিয়ামক রূপ নিয়ে উপস্থিতহলেও বর্তমান যুগে যুদ্ধ বাধবার মূল কারণ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত নয়। আধুনিক যুদ্ধের মূল কারণ নিহিত রয়েছে বাজার দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির পরস্পরের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের মধ্যে।

সারা দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া অথবা দুনিয়াজোড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দ্বারা দু-একটি পুঁজিবাদী দেশ পরিবেষ্টিত হওয়ার মত পরিস্থিতি দেখা দিলেই একমাত্র যুদ্ধকে মানবসমাজ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব। তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া আজ আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার না হলেও সমাজতান্ত্রিক শিবির যে আজও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবির কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং আঞ্চলিক ও আংশিক নানা রূপে যুদ্ধ যে এখনও চলছে এবং যার মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ সৃষ্টি হওয়ার বিপদ রয়েছে — কোন মোহের বশবর্তী হয়ে এই কঠোর বাস্তব সত্যটিকে ভুলে গেলে শান্তির বিজয়কে কার্যকরী করার ব্যাপারে বাস্তব পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে, দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনকে তত্ত্বগতভাবে নিরস্ত্র করে ফেলা হবে এবং নানা ধরনের সংস্কারবাদী-শোধনবাদী ঝোঁক যা সাম্যবাদী আন্দোলনে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বস্তুত আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির কথা ছেড়ে দিলেও ইতিমধ্যেই পৃথিবীর কিছু কিছু পুঁজিবাদী দেশের সাম্যবাদী দলগুলির আচরণের মধ্যে — ‘যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের থিসিস এখন অচল’ — এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। এর ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত ইচ্ছা পোষণ করা সত্ত্বেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্রকেই শক্তিশালী করা হবে।

কাজেই সাম্যবাদীদের মনে রাখতে হবে, আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষা করার সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ লেগে যাওয়ার বিপদ — দুইই বাস্তব সত্য। এর একটির ওপর অনাবশ্যক জোর দিতে গিয়ে, অপরটিকে খাটো করে দেখলে অমার্জনীয় ভুল করা হবে। এবং এই ধরনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই কিছু কিছু কমিউনিস্ট নেতা শান্তি রক্ষা করার বাস্তব পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে রাষ্ট্রসংঘের ভেতরে ও বাইরে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালানো, নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব, শান্তি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক শিবির কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ প্রভৃতি বিষয়গুলির (শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে এইসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই) উপরেই মুখ্যত জোর দিচ্ছেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও তীব্রতর করা, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে শক্তিশালী করার (যার ওপর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষা নির্ভর করছে) গুরুত্বকে খাটো করে দেখছেন। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে তীব্রতর করার উপর মূলত ভিত্তি করে শান্তি আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই শান্তিকে স্থায়ীভাবে ও কার্যকরীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

‘যুদ্ধ ও শান্তি’ অথবা ‘পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি’ বা অন্য যেকোন প্রশ্নই হোক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বদা বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত ও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই তা বিচার করে থাকে। কাজেই শান্তি আন্দোলনের মত একটি গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার সময় কমিউনিস্টদের একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের (bourgeois pacifist) মত যেকোন মূল্যে নিছক শান্তিরক্ষার জন্য আজকের দিনের ব্যাপক ও শক্তিশালী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন নয়। ...এই গতিবেগকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান শান্তি আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি পরিচালনা করতে হবে।

[সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলুন

দুয়ের পাতার পর

বছর শোষণ-লুণ্ঠন ও অনাহার-বেকারির শিকার হয়ে হয়ে আজ ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছে। আর্জেন্টিনা থেকে মুক্তবাণিজ্যের চুক্তি না করেই ফিরে যেতে হয়েছে জর্জ বুশকে। এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, দক্ষিণ কোরিয়ায় আন্দোলন জেগে উঠছে।

বিশ্বের এই বর্তমান চেহারা মুখ বন্ধ করে দিয়েছে সেইসব তথাকথিত তাত্ত্বিকদের, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্বে এক পরম শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ফানুস উড়িয়েছিলেন। এঁরা বুঝিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বলে কিছু নেই, অথবা তার চেয়ে উন্নততর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলেও কিছু হয় না। এখন বিশ্ব নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, যেটা 'বিশ্বায়নে'র যুগ। এই যুগে পুঁজিকে অবাধে বিশ্বে চলাচল করতে দিলেই সকল দেশে উন্নয়নের গতি আসবে, উন্নত-অনুন্নত বলে কিছু থাকবে না। এইসব নয়া তত্ত্ববিদরা কেবল বুর্জোয়া চিন্তার ধারক বলে পরিচিত তা নয়, এঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন বা আছেন, যাঁরা বামপন্থী, এমনকী মার্কসবাদী বলে পরিচিত। বুর্জোয়া তত্ত্ববিদদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে এঁরা বললেন, মার্কস পুঁজিবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এখন অচল। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যাও এখন খাটে না, কারণ পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। আমাদের দেশে সি পি এম-এর মতো বিশ্বের বহু দেশেই মার্কসবাদী নামের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলো, এমনকী বুর্জোয়া শিবিরে যোগ দিয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বাস্তব', 'এর কোনও বিকল্প নেই', 'এখন শ্রমিক বিপ্লবের পরিস্থিতি নয়', 'এখন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করা চলবে না' — এসব বুলি আউড়েছে।

কিন্তু আজকের বিশ্বপরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে, পুঁজিবাদের যে মূল চরিত্রকে মার্কস উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের যে বৈশিষ্ট্য লেনিন ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, তা অভ্রান্ত। কারণ মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথ বেয়ে সমাজে পুঁজির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের পথেই তাঁরা এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বস্তুত, একই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার পথ বেয়ে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের পরে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই আজ আমরা বাস্তব ঘটনায় চাক্ষুষ করছি। লেনিন দেখান যে, এই যুগে হয় সরাসরি শাসনব্যবস্থা দখল করে, না হয় নানা অর্থনৈতিক জাল বিছিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিকে বেঁধে ফেলবে। তিনি আরও দেখান যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বভাববৈশিষ্ট্য হিসাবেই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে সামনে রেখে লেনিন দেখান, এই যুদ্ধের মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্বকে নিজ নিজ লুঠের এলাকায় ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ। সেদিন বিশ্বজুড়ে অন্যান্য মার্কসবাদীরাও ছিলেন, বড় বড় তত্ত্ববিদেরও অভাব ছিল না। সকলেই ভেবেছেন, কী করে এই যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, কী করে বিশ্ব থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে নির্মূল করা যায়। লেনিনের অনন্যতা এখানেই যে, তিনি কেবল সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যাই করেননি, সাথে সাথে দেখিয়েছেন, এই সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ। বিশ্বে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করতে হলে, দুনিয়ার বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে। এজন্যই লেনিন, বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে বললেন, যুদ্ধ থেকে মুক্তি চাইলে, এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে, যার লক্ষ্য হবে দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরপরই লেনিন তা বাস্তবে করে দেখান। ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া যত দেশ ও ভূখণ্ড দখল করেছিল, লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র সেই সমস্ত ভূখণ্ডের উপর সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে। বিশ্বে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রথম, যা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের দাবি তুলেছিল।

কীসের ভিত্তিতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র, যুদ্ধের মূল কারণ, শান্তির প্রকৃত রাস্তার সন্ধান পেয়েছিলেন ? এখানেই মার্কসবাদী বিজ্ঞানের অনন্যতা। এই বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা শুধু নয়, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই মহান লেনিন শুধু রুশ শ্রমিকশ্রেণী নয়, গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াইয়ের পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। এই মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিচারধারাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে স্ট্যালিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের দুর্গ হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ফ্যাসিস্ট জার্মানিই শুধু নয়, ব্রিটেন-আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ধরতে পেরে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে ও বিজয়লাভ করতে সফল হয়েছিলেন।

আজও ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের দেশে দেশে যারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত আছেন, তাদেরকেও লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা থেকে এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে যদি সঠিক লক্ষ্যে ও বিজয়ের পথে পরিচালিত করতে হয়, তবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক বিচারধারা আয়ত্ত করতে হবে এবং দেশে দেশে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে।

২৫ নভেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে

সিলেকটেড ওয়ার্কস অফ শিবদাস ঘোষ

ভল্যুম - ৩

দাম ঃ পেপার ব্যাক - ৮০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই - ১০০ টাকা

অর্থনৈতিক অবরোধ যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর

ছয়ের পাতার পর

পিষে মারার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত যখন চরমে সেই সময় সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে আমরা একই বিশ্বগ্রামের (global village) বাসিন্দা। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে সেই বিশ্বগ্রাম, যে বিশ্বগ্রামের সদস্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে মার্কিন তাঁবেদারি মেনে নেওয়া।

অর্থনৈতিক অবরোধের মতো মৌলিক মানবাধিকারের নিষ্ঠুরতর লঙ্ঘন আর কিছু নেই। কেন একে বলা হচ্ছে যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর? কারণ অর্থনৈতিক অবরোধ কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। যুদ্ধেও কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়। অবরোধ একতরফা। 'অর্থনৈতিক অবরোধ গণহত্যার সামিল', এটাই 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ', বলেছেন নিকারাগুয়ার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিশপ নিগুয়েল ডি এসকলো।

ফ্যাসিস্ট নাৎসিদের বিচার শেষে নুরেমবার্গ ঘোষণাপত্রে অবরোধ নীতিকে মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধ (crime against humanity) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। একইসঙ্গে অবরোধ নীতিকে রাষ্ট্রসংঘের দাবি সনদ, জেনেভা কনভেনশন এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক দলিলগুলির চূড়ান্ত লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত করে। এই মারণ অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য এক আন্তর্জাতিক আবেদনপত্র মার্কিন সরকার, রাষ্ট্রসংঘ এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হয়। এই আবেদনপত্র তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক। এই আন্তর্জাতিক প্রতিবাদপত্র ঠাঁই পায় বাজে কাগজের ঝুড়িতে। গণতন্ত্রকে নাকি আমেরিকা মূল্য দেয়। পর পর ১৪ বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য একযোগে প্রায় সব রাষ্ট্রই সরব হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাতেও 'কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগ (financial) সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক কিউবা উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে ১৭৯টি রাষ্ট্র ভোট দিয়েছে, প্রস্তাবের বিপক্ষে আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিনটি রাষ্ট্র, ইজরায়েল ও দুটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সংখ্যালঘুরা মান্যতা দেবে, বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম যুগের এই ধারণাকে আজ অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ পদদলিত করছে।

বছরের পর বছর অবরোধ জারি রেখে আমেরিকা কিউবা সরকারকে মাথা নত করাবে বলে ভেবেছিল। তারা ধরে নিয়েছিল অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব সৃষ্টি হলে, জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হলে, আমেরিকা নানাভাবে সেই ক্ষোভে মদত দিয়ে দেশে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে দেবে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

এরপর তারা চেষ্টা করেছে কিউবার অবিসংবাদী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করাতে, বার বার সেই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। কিউবার ভিতরে এজেন্ট চালান করার চেষ্টা চালিয়েছে আমেরিকা। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়েছে। এমনই এক সন্ত্রাসবাদী পাণ্ডা পোসাভা ক্যারিলেসকে দিয়ে বহু অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র করিয়ে এখন তাকে আমেরিকা আশ্রয় দিয়েছে। বিপ্লবের পরেই ক্যারিলেস কিউবা ছেড়ে পালায়, ভেনেজুয়েলার নাগরিকত্ব নেয়। মার্কিন মদতে সে হয়ে ওঠে ল্যাটিন আমেরিকার সন্ত্রাসবাদীদের পাণ্ডা, বহু কুকীর্তির নায়ক। ল্যাটিন আমেরিকার ১৭টি দেশ একযোগে দাবি জানিয়েছে, ক্যারিলেসকে বিচারের জন্য ভেনেজুয়েলার হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন হুঙ্কার যদি সত্য হত, তবে ক্যারিলেসের প্রত্যর্পণে আমেরিকার রাজি হওয়ার কথা। কিন্তু আমেরিকা রাজি নয়।

অবরোধ, অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাসবাদীদের মদত কোন কিছু দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবাকে নতজানু করাতে পারেনি। বরং কিউবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের কাছে প্রেরণা হয়ে উঠেছে। আজ যে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিউবা — নেতা ফিদেল কাস্ত্রো, এখন সাথে যুক্ত হয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজ।

সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার 'অখণ্ড বিশ্ববাদ'

সাতের পাতার পর

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ) বদলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তুলে ধরেছে তার নিজের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ। অক্টোবর বিপ্লবের আগে যে দেশে জাতীয় শোষণ, নিপীড়ন আর স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব ছিল, আজ সেই দেশে জাতিগুলির মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে।

সোভিয়েতবাসীর দেশপ্রেম সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পৃথিবীর সমস্ত জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতাই হল দেশপ্রেমের তাৎপর্য। মহান মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েত দেশপ্রেমের যাচাই হয়ে গিয়েছে। লেনিন ও স্ট্যালিনের পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করতে পেরেছে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে জার্মানী ও জাপানী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে যুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সোভিয়েতের সশস্ত্র সাহায্য না পেলে তাদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হোত না।

সোভিয়েতের শান্তির ও মৈত্রীর আন্দোলনের এবং নতুন যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে সোভিয়েত ও নয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্তকারী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি খ্যাপা কুকুরের মতো গোঁ গোঁ করছে। এই যুদ্ধের চক্রান্তকে সফল করার জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদ তাদের একটি হাতিয়ার। বিশ্ব মানবের কল্যাণকামী সেজে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশগুলিতে ঢুকে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছে, সোভিয়েটের প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে তাদের আক্রমণের এবং কামানের খোরাক যোগাবার ঘাঁটি বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ইতিহাসের গতি থেকেই দেখা যায় ও বলা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অন্য জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা সফল হবে না। ''জাতীয় প্রশ্ন ও লেনিনবাদ'' প্রবন্ধে স্ট্যালিন ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, জাতি ও জাতীয় ভাষাগুলি অত্যন্ত স্থায়ী এবং সেগুলি বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রচণ্ড শক্তি রাখে। স্ট্যালিনের উদাহরণ থেকেই বলা যায় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অখণ্ড বিশ্ববাদের বা জাতীয় নিহিলিজমের বিষ দিয়ে জাতিগুলির মনকে বিষাক্ত করতে পারবে না।...

(ইজভেস্তিয়া পত্রিকা থেকে ১৯৪৯ সালে গণদাবী পত্রিকায় প্রকাশিত)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in